A Tribute to BAPU on His 150th Birth Anniversary

Volume 1, Issue 1
2nd October, 2019

CANVAS

A Bilingual E-Magazine

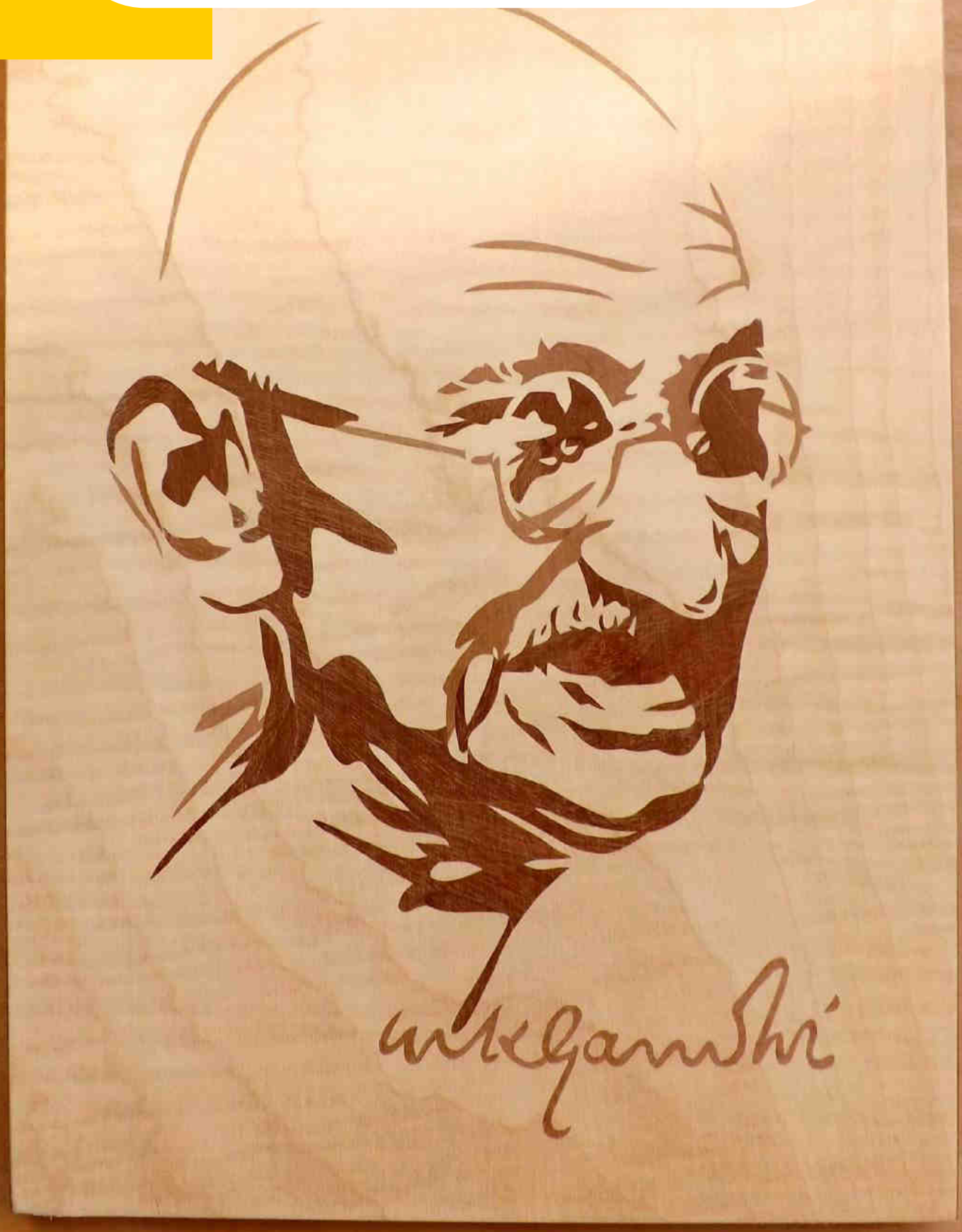

GITANJALI TEACHERS' TRAINING COLLEGE
CHOA, HARIHARPARA, MURSHIDABAD

Volume 1
Issue 1

EDITORIAL

*Welcome to the 1st Edition of our first bilingual E-magazine, **CANVAS**. We are really proud and exuberant to acclaim that in this very issue we have got the opportunity to celebrate the 150th birth anniversary of Bapu, Mohandas Karamchand Gandhi.*

This magazine is to be viewed as a launch pad for students' creative urges to blossom. As well as it can be viewed as a window through which we can express our ideas on society and education. This humble initiative is to allow the budding minds free to roam in the realm of imagination and experience which creates a world of beauty in words.

This issue is primarily focused on two points, the views and thoughts of Gandhiji and the grave concern on the addiction to single-use or disposable plastic which creates severe environmental consequences. There are a number of things that governments can do – from running public awareness campaigns, to offering incentives for recycling, to introducing levies or even banning certain products. In the last decade, dozens of national and local governments around the world have adopted policies to reduce the use of disposable plastic. Being a country of 1.37 billion people India is struggling to dispose its growing quantities of plastic waste. We are approaching towards a massive destruction which can only be cured through consciousness in our day to day life.

William Wordsworth, had once marvelled at "a host of golden daffodils ... fluttering and dancing in the breeze." And as the editor of this magazine, I too experienced such delightful moments as we wandered, mesmerized among the magical daffodils of words woven by our very own talented and creative students.

Mid-way through editing and designing a pile of articles which I was nose deep in and with the thoughts of the zillion things that 'JUST HAD TO BE DONE'; I pulled at my hair for the very first time. This was the first of many such moments! I felt from my heart that putting a magazine together was no cake walk. I along with my editorial team members have struggled a lot to make this magazine stand out.

I would like to thank all my editorial team members for helping me pull this through. I express my considerable appreciation to all the authors of the articles in this magazine. These contributions have required a generous amount of time and effort. It is this willingness to share knowledge, concerns and special insights with fellow beings that has made this magazine possible.

We hope the magazine continues to evolve as a creative and vibrant space for the students to discover and nurture their literary talent.

SOUMAVA SINHA

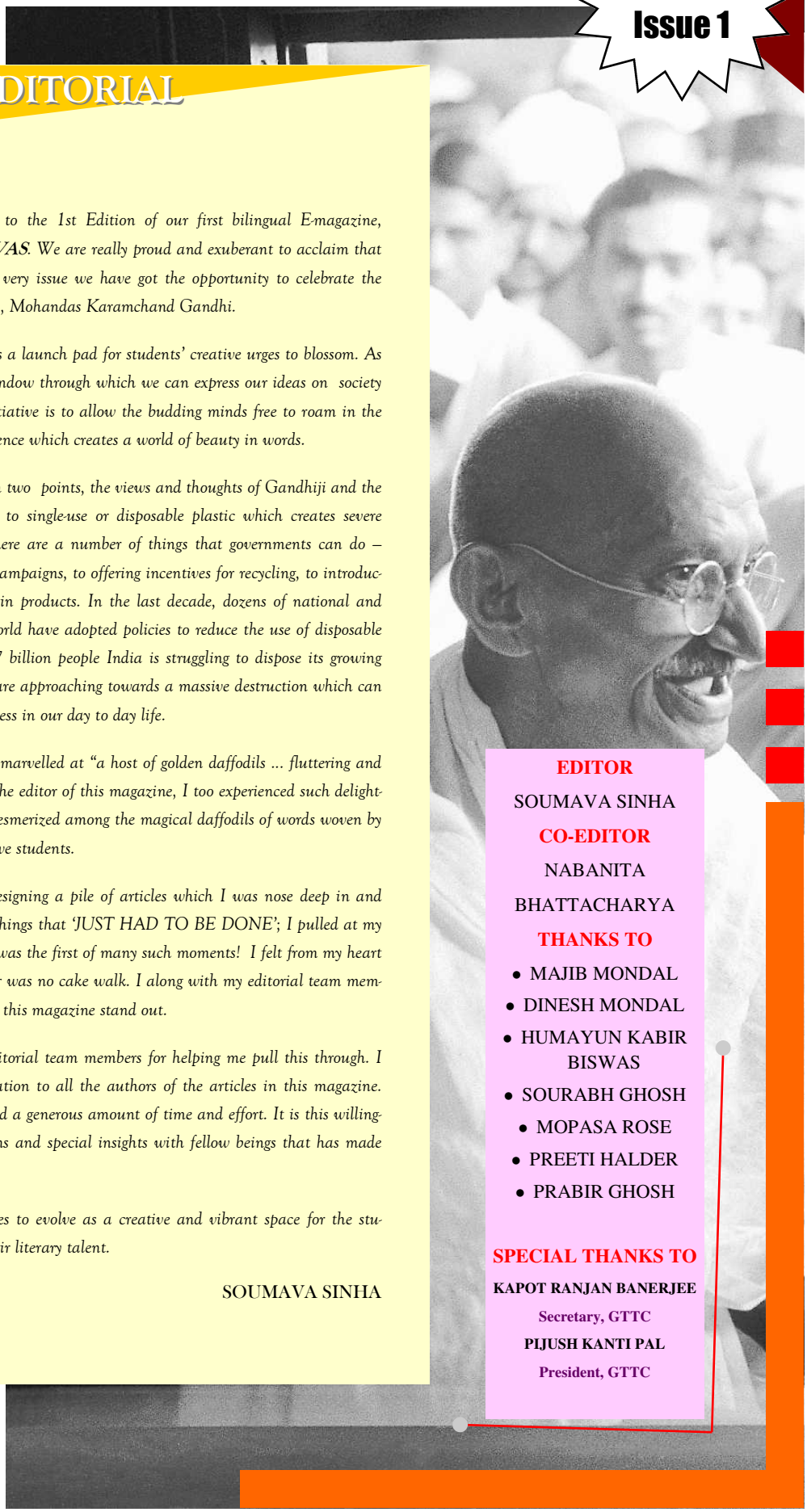

EDITOR

SOUMAVA SINHA

CO-EDITOR

NABANITA BHATTACHARYA

THANKS TO

- MAJIB MONDAL
- DINESH MONDAL
- HUMAYUN KABIR BISWAS
- SOURABH GHOSH
- MOPASA ROSE
- PREETI HALDER
- PRABIR GHOSH

SPECIAL THANKS TO

KAPOT RANJAN BANERJEE
Secretary, GTTC
PIJUSH KANTI PAL
President, GTTC

GITANJALI TEACHERS TRAINING COLLEGE
ESTD. - 2012
W.B.
CHOA, HARIHARPARA, MSD.

SPECIAL POINTS OF INTEREST:

- Mahatma Gandhi– His Life and Philosophy.
- Value Education.
- Teacher Education.
- Teacher-Student Relationship.
- Plastic Pollution & Its Prevention.
- Environment & Our Responsibilities.

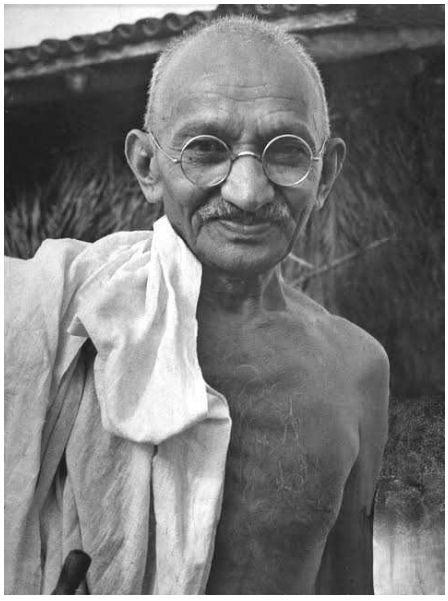

"MY LIFE IS MY MESSAGE"

INDEX

INSIDE THIS ISSUE:

স্মরণালোকে জাতির জনক	4
From MOHAN to MAHATMA	8
মহাত্মা গান্ধীর মূল্যবোধ শিক্ষা	9
শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্ক	10
একজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে কেমন সম্পর্ক হওয়া উচিত	11
শিক্ষার গুরুত্ব	12
শিক্ষক প্রশিক্ষণ এক বাঞ্ছনীয় প্রক্রিয়া	14
The Three Wise Monkeys	15
#BEAT_PLASTIC_POLLUTION	16
Our planet is drowning in Plastic Pollution	17
Our Responsibilities on Environment	19
Teacher-Student Relationship	20
'Guru-Shishya'	20
Poster– M. K. GANDHI	21
The Prophet and the Poet	22
ENDNOTE- TEACHER EDUCATION INSTITUTIONS: QUALITY VS QUANTITY	23

স্মরণালোকে জাতির জনক

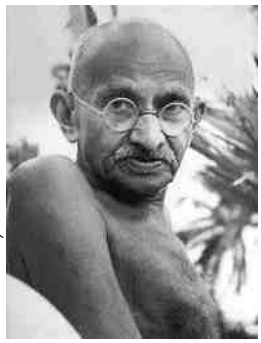

"জগতে কচি মহাগুরুর আবির্ভাব হয়। এইরূপ গুরুর আগমনের পূর্বে হয়তো শত শত ব সর চলিয়া যায় তাহার জীবনের মধ্যে দিয়ে লোকে তাহাকে জানিতে পারে। তিনি প্রথমে জীবনব্রত উদযাপন করেন এবং পরে বলিয়া যান কি করিয়া তাহারা অনুরূপ জীবন যাপন করিতে পারিবেন। গান্ধীজী ছিলেন এইরূপ একজন আচার্য।"

—ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী , এই মহাদেশ এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যিনি মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনেননি। কেউ বা তাকে বাপু বলে ডাকতে পছন্দ করেন। ধুতি আর চাদর পরিহিত শুকনো খটখটে মানুষটা ভারতবর্ষের জাতির পিতা। যিনি সারা জীবন ধরে ছিলেন অহিংসার পূজারী এবং যার জীবনের লক্ষ্য ছিল ঈশ্বর দর্শন ও আত্মদর্শন। এই ব্রতকে অবলম্বন করে সারাজীবন ছুটে চলেছেন অহিংসার পথে । হিংসার এই উত্তপ্ত পৃথিবীতে তিনি ফোটাতে চেয়েছেন অহিংসার ফুল।

আজ আমরা সেই মহামানবের ১৫০ তম জন্মবর্ষে দেখে নেব, এবং শুনে নেব তার শৈশব কাল থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন ওঠাপড়া এবং বিভিন্ন ধাপ।

"জগতকে নতুন করিয়া শিখাইবার আমার কিছুই নাই। সত্য ও অহিংসা শাশ্বত এবং সনাতন । " এই সত্যের পূজারী মহাত্মা গান্ধী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৬৯ সালের ২ অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরের একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে। তার পিতা করমচাঁদ গান্ধী, যিনি ছিলেন পোরবন্দরের দেওয়ান বা মন্ত্রী এবং মাতা ছিলেন পুটলিবাই। গান্ধীজীর পরিবার জাতিতে ছিলেন বেনীয়া। সম্ভবত গোড়ায় মুদিখানার ব্যবসা করতেন কিন্তু তাঁর পিতামহ থেকে তিন যুগ পর্যন্ত তারা কাথিয়াওয়াড়ের এর বিভিন্ন রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ছোটবেলায় প্রচন্ড লাজুক ছিলেন, কারো সঙ্গে মিশতেন না। বই ও লেখাপড়া ছিল তার একমাত্র সঙ্গী। ঘন্টা বাজলেই স্কুলে হাজির হওয়া ও স্কুল ছুটি হলে বাড়িতে ছুটে চলে যাওয়া, এটাই ছিল গান্ধীজীর প্রতিদিনের অভ্যাস । উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রথম ব সর পরীক্ষায় একটি ঘটনা ঘটে যায়। শিক্ষাপরিদর্শক জাইলক পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন স্কুল। বানান অনুশীলনের জন্য তাদের পাঁচটি শব্দ লিখতে দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল kettle. তার বানানে ভুল হয়েছিল। শিক্ষক তাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, তিনি চেয়েছিলেন পাশের ছেলেটির শ্লেটটি দেখে তিনি যেন নকল করেন । কিন্তু, তা তিনি করতে পারেননি । ফলে দেখা গেল তিনি ছাড়া অন্য সকলেই প্রতিটি বানান শুদ্ধ লিখেছে । নকল করবার বিদ্যেটি তিনি কোনোদিনই রপ্ত করতে পারেননি।

১৮৮৩ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে মহাত্মা গান্ধী তার বাবা মায়ের পছন্দে ১৪ বছর বয়সী কস্তুরীবাঈ মাখাজীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। শুধু তাই নয় গান্ধীজীর সমস্ত আন্দোলনের অনুপ্রেরণাদাত্রী ছিলেন কস্তুরীবাঈ। তাঁদের চার সন্তান জন্মায়, যথা— হরিলাল, মণিলাল, রাম দাস ও দেব দাস।

১৮৮৭ সালে গান্ধীজী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন। এরপর ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮ বছর বয়সে ব্যারিস্টার পড়ার জন্য তিনি ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের ভর্তি হন। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার বড় সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সেখানকার অদ্ভুত লোক, অদ্ভুত চালচলন, অদ্ভুত বাসস্থান , সেসব ছিল তার কাছে একেবারে আনকোরা। অথচ তিনি তিন বছরের আগে ভারতবর্ষে ফিরতেও পারবেন না ।

গান্ধীজী সারা জীবনে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন । তার মধ্যে অন্যতম হলো ধূমপান এবং গোমাংস ভক্ষণ। তাঁর মা পুতলিবাঈ ছিলেন একজন কঠিন ধর্মানুরাগী মানুষ। তিনি প্রতিদিন উপোস করতেন এবং নিরামিষাশী ছিলেন। ফলে গান্ধীজী কঠিন অনুশাসনের মধ্যে বড় হন। কোনো বদ অভ্যাস গান্ধীজীর মধ্যে ছিল না। ফলে ছোট থেকেই তার মা জীবে দয়া অহিংসা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের কথা শোনাতেন। তিনি যখন বিদেশ যাত্রা করেন, তখন জৈন সন্ন্যাসী বিচার্যীর সামনে তার মার কাছে শপথ করেছিলেন যে মদ মাংস এবং উশৃঙ্খলতা ত্যাগ করে হিন্দু নৈতিক উপদেশ পালন করবেন । তিনি ইংরেজ আদব কায়দা পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করেছিলেন; যেমন নাচের শিক্ষা, গান-বাজনার শিক্ষা। কিন্তু তিনি তাঁর বাড়িওয়ালীর দেওয়া ভেড়ার মাংস এবং বাঁধাকপি খেতেন না। তিনি লন্ডনের গুটি কয়েক নিরামিষভোজী খাবারের দোকানের একটিতে প্রত্যহ ১০ থেকে ১২ মাইল হেঁটে নিয়মিত যেতেন। কিন্তু সেই খাবারও তাঁর কাছে তৃপ্তির ছিল না। শুধু তাঁর মায়ের কথায় সাধারণ নিরামিষভোজী জীবন যাপন না করে তিনি এ বিষয়ে পড়াশোনা করে একান্ত আগ্রহী হয়ে নিরামিষভোজন গ্রহণ করেন। "নিরামিষভোজী সংঘে" যোগ দেন এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাদী গান্ধীজী একবার তার বড় ভাইয়ের সাথে ধূমপান করেন কিন্তু তার ভালো লাগেনি। একবার তার বন্ধু শেখ মেহেতাভ তাকে বুঝিয়েছিলেন, ইংরেজরা মাংস খায় বলেই তারা এত বুদ্ধিমান, দেশ শাসন করে । আর ভারতীয়রা নিরামিষ খায় বলেই তারা এখনও প্রজা হয়ে আছে । তাই গান্ধীজি এই কথায় প্রভাবিত হয়ে গোমাংস খেয়েছিলেন ।

তিনি ব্যারিস্টার হয়ে ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফেরেন ১৮৯১ সালের 12-ই জুন। ধুতি চাদর পরিহিত নিরামিষভোজী গান্ধিজি ইংল্যান্ডে থাকাকালীন দস্তুর মত সাহেব ছিলেন। তিনি নাচ ও বেহালা শিখতেন । তিনি বোম্বাই আদালতে প্রথম আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে তিনি দাদা আব্দুল্লাহ এন্ড কোম্পানি নামক এক ভারতীয় কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ২১ বছরে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের বৈষম্যমূলক আচরণ তাঁকে প্রতিবাদী করে তোলে । একদিন ডারবান আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর পাগড়ি সরিয়ে ফেলতে বললে গান্ধীজী তা অগ্রাহ্য করেন এবং আদালত কক্ষ থেকে ক্ষোভে বেরিয়ে যান । পিটার ম্যারেজবার্গের একটি ট্রেনে ভ্রমণ করবার সময় গান্ধীজীর কাছে প্রথম শ্রেণীর টিকিট থাকলেও "কালা আদমী" বলে তাঁকে তৃতীয় শ্রেণীতে যেতে বাধ্য করা হয়। এই ঘটনাটি গান্ধীজীর মনে দাগ কেটেছিল।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতে সংক্ষিপ্ত সফর করেন। এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অধিকার নিয়ে তিনি আন্দোলন করেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতীয়দের নিয়ে একটি অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী গঠন করেন । ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি ইউরোপীয় পোশাক ও দুধ খাওয়া বন্ধ করে শুকনো খাবার ও তাজা ফল খেয়ে জীবন ধারণের অভ্যাস করেন ও একদিন করে অনাহারে থাকা অভ্যাস করেন। তিনি ছিলেন সত্যগ্রহ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। ভারত সরকার তাঁর সম্মানার্থে তাঁকে ভারতের জাতির জনক হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসার পর সমগ্র ভারতব্যাপী দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারী স্বাধীনতা, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ , জাতির অর্থনৈতিক সচ্ছলতা সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রচার শুরু করেন।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সাফল্য লাভ করেন। ওই বছর চরকায় সুতো কেটে কাপড় তৈরীর ধারণা লাভ করেন । গান্ধীজি ১৯১৮ সালে চম্পারন বিক্ষোভ ও খেদা সত্যাগ্রহ নিজেকে নিয়োজিত করেন । বিহারের চম্পারণে নীলচাষীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ একই বছর আমেদাবাদের বস্ত্র কারখানায় শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন করেন।

তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হলো অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ৪-ঠা সেপ্টেম্বর নাগপুরে অধিষ্ঠিত কংগ্রেসের এক অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব রাখেন। গান্ধীজী কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব সকলের সামনে ব্যক্ত করেন । যেমন খিলাফ সমস্যার যথাযথ সমাধান , জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ, একবছরের মধ্যে স্বরাজ অর্জন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, মাদক বর্জন ইত্যাদি।

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নির্বাহী দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ১৯৩০ সালের ডান্ডি অভিযান ও লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন। লবণের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করায় গান্ধীজী ভারতীয়দের সাথে হাজার হাজার মাইল পথ হেঁটে ডান্ডির উদ্দেশ্যে রওনা দেন । এ সময় তার সহযাত্রী ছিলেন প্রায় ৬০,০০০ ভারতীয়। ইতিহাসে একে "salt marge" বলে। শুধুমাত্র নিজ হাতে লবণ তৈরির জন্য পায়ে হেঁটে ১২-ই মার্চ থেকে ৬-ই এপ্রিল পর্যন্ত এলাহাবাদ থেকে ডান্ডি পৌঁছান। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে , হাটা নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর এক বিশেষ খ্যাতি ছিল । গান্ধীজি তার জীবনে এত হেঁটেছিলেন যে পুরো পৃথিবী দুবার চক্কর দেওয়া হত , তিনি দিনে প্রায় ১৮ কিলোমিটার হাটতেন।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন ছিল গান্ধীজীকৃত আন্দোলনের মধ্যে অন্যতম। ১৯৪২ সালে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে শ্বেতাঙ্গ বিরোধী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত ব্যপক আন্দোলন ছিল এটি। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রধান তিনটি পর্ব দেখা যায় ।

প্রথম পর্বে এই আন্দোলন প্রধানত শহর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু দ্রুততার সাথে পুলিশ ও সামরিক বাহিনী এই আন্দোলনকে দমন করে। এই পর্বের আন্দোলন ছিল ব্যাপক ও সহিংস।

আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় আগস্টের মধ্যভাগে। এই পর্যায়ে ছাত্ররা বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ছড়িয়ে পড়ে। তারা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে উত্তর পশ্চিম বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পূর্বাঞ্চল, মেদনীপুর, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, উড়িষ্যা, অঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে আন্দোলনে তৃতীয় পর্ব শুরু হয় এই পর্বের বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় ও কৃষকদলের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং গেরিলা যুদ্ধ। মেদিনীপুরের তমলুক, মহারাষ্ট্রের সাঁতরা, উড়িষ্যার তালচের অঞ্চলে এই আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

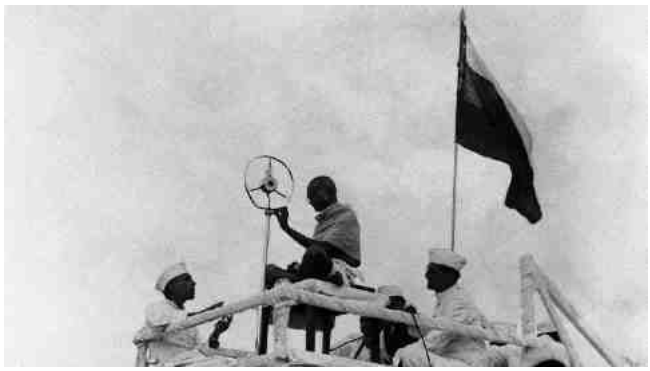

চৌরিচৌরার ঘটনা গান্ধীজীর জীবনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ৫-ই ফেব্রুয়ারি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত গোরখপুর জেলায় অবস্থিত চৌরিচৌরা অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিক্ষোভকারীদের একটা বড় দল ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা একটি পুলিশ থানায় আগুন দেয় এবং প্রত্যুত্তরে পুলিশ গুলি চালায়। এই ঘটনায় ৩-জন নাগরিক এবং ২৩ জন পুলিশ পুড়ে মারা যান। এই সহিংস আন্দোলনে গান্ধীজী ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই ঘটনার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখে।

এবার গান্ধীজী জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনার দিকে আলোকপাত করা যাক—

গান্ধীজীর নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য পাঁচবার তথা ১৯৩৭ , ১৯৩৮ , ১৯৩৯ এবং ১৯৪৭ সালে মনোনীত হয়েছিলেন, কিন্তু পাওয়া হয়নি একবারও। আরেকবার মনোনীত হন ১৯৪৮ সালে কিন্তু সে বছরই জানুয়ারি মাসে তিনি মারা যান। পরে ওই বছর নোবেল শান্তি পুরস্কার কাউকে দেওয়া হয়নি। কারণ হিসেবে নোবেল কমিটি বলেছিলেন, পুরস্কার দেওয়ার মত যোগ্য কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। গান্ধীজি পুরস্কারটি না পাওয়ায় নোবেল কমিটি আফসোস করেছিল বেশ কয়েকবার। চারটি মহাদেশের বারোটি দেশের নাগরিক অধিকার আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর হাত ধরেই। ভারতে ৫৩-টি প্রধান রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে তাঁর নামে, শুধু তাই নয় বাইরের দেশেও তার নামে প্রায় ৪৮ টি রাস্তা আছে। স্টিভ জোবস মহাত্মা গান্ধীর বড় ভক্ত ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি সম্মান স্বরূপ তিনি গোল ফ্রেমের চশমা পড়তেন । গান্ধীজী ইংরেজি বলতেন আইরিশ উচ্চারণে, কারণ তাঁর শুরুর দিককার একজন শিক্ষক ছিলেন আইরিশ। আইনস্টাইন, হিটলার সহ অনেকের সাথে তার যোগাযোগ ছিল । এমনকি হিটলারকে লেখা এক চিঠিতে তাকে "Dear Friend" বলে সম্বোধন করেছেন গান্ধীজী।

গান্ধীজী নামের সঙ্গে জুড়ে আছে মহাত্মা পদবী , এই পদবীটি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১৫ সালে শান্তিনিকেতনে ভ্রমণের সময় গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করেন, জবাবে কবিগুরু বলেন আমি যদি 'গুরুদেব' হই তাহলে আপনি 'মহাত্মা'। তারপর থেকেই গান্ধীজী 'মহাত্মা' নামে পরিচিত হন। গান্ধীজী কে "জাতির জনক" নামে ডাকা হয় সেই পদবী ১৯৪৪ সালের ৬-জুলাই তাকে দিয়েছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ।

ভারতবর্ষে একমাত্র মহাত্মা গান্ধী Time Person of the year খেতাব পান। South Africa-য় তাঁর অবস্থানের শুরুর দিকে তিনি British Army-তে strature বহনকারীদের স্বেচ্ছাসেবী হয়েছিলেন। ডারবান, প্রিটোরিয়া ও জোহান্সবার্গে তিনটি ফুটবল টিম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গান্ধীজি । প্রত্যেকটিরই নাম দিয়েছিলেন Passive Resisters Soccer Club.

মহাত্মা গান্ধীর উদারতার কথা আমরা সবাই জানি। একবার ট্রেনে ওঠার সময় মহাত্মা গান্ধীর একটি পায়ের জুতো পড়ে যায়। তখনই সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি জুতো ছুড়ে ফেলেন, যা পড়ে যাওয়া জুতোর কাছাকাছি গিয়ে পড়ে। যাতে সহজে কেউ জুতোজোড়া পেয়ে যান। South Africa-র নাটালে দাদা আব্দুল্লাহ কোম্পানির আইনজীবী হিসাবে গান্ধীজীর বেতন ছিল ১৫ হাজার ডলার, বর্তমান সময় হিসেব করলে যা দাঁড়ায় ১২ লাখ টাকার ওপরে। গান্ধীজী অনায়াসে সেই সময় শীর্ষ ৫ ধনী ভারতীয় তালিকায় আসতে পারতেন, কিন্তু তিনি সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভারতে সত্যগ্রহ হিসেবে কাজ করার জন্য ফিরে আসেন । স্বাধীনতা ঘোষণার সময় তিনি দিল্লিতে উপস্থিত ছিলেন না , তাই তিনি সেটা উদযাপন করতে পারেননি। তিনি তখন বাংলায় দাঙ্গা ঠেকানোর কর্মসূচির অংশ হিসেবে অনশন কর্মসূচি পালন করছিলেন।

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি, ভারত ভাগের প্রায় দেড় বছর পরেই দিল্লির বিড়লা হাউসে হত্যা করা হয় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে। বিড়লা হাউস দিল্লির সুপরিচিত ব্যবসায়ী ঘনশ্যাম দাস বিড়লার একটি বড় বাড়ী। তিনি নিজেও গান্ধীজীর অনুসারী ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর শেষবারের মত গান্ধীজী দিল্লিতে আসেন। এর আগেও যখনই তিনি দিল্লি এসেছেন, প্রত্যেকবার তিনি 'ভাঙ্গি কলোনি' নামেক এক জায়গায় থাকতেন। কিন্তু শেষবার তিনি যখন দিল্লি আসেন, তখন অন্যান্য জায়গার শরনার্থীরা থাকার ফলে তাঁকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল বিরলা হাউসে। মূলত হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে অশান্তি থামানোর জন্য তিনি দিল্লিতে এসেছিলেন। কিন্তু দিল্লিতে এসে দেখলেন মুসলমানদের ওপর হামলা হচ্ছে। তখন তিনি সিদ্ধান্ত নেন তিনি দিল্লিতেই থেকে যাবেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক অপূর্বানন্দ বলেছিলেন, কলকাতায় তিনি যেটা করেছিলেন অর্থা হিন্দু আর মুসলিমদের মধ্যে মিল সেটি দিল্লিতেও করতে চেয়েছিলেন। এছাড়া শিখ এবং হিন্দুদের তিনি বোঝাতে চেয়েছেন মুসলমানদের ওপরে যেন হামলা না করে। বিরলা হাউসে ছিল তাঁর অফিস। রাজনৈতিক সমস্ত বৈঠক সেখানে অনুষ্ঠিত হতো। রাজনীতিবিদ ছাড়াও সাধারণ মানুষ আসতেন তার সাথে দেখা করতে বিভিন্নভাবে অভিযোগ অনুযোগ নিয়ে।

স্বাধীনতার পরপরই ছিল সময়টা। অধ্যাপক অপূর্বানন্দ বলেছেন, বিড়লা হাউস থেকে তিনি সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সচিব এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের সাথে প্রতিদিনই বৈঠক করতেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান এবং ভারত নামে দুটি পৃথক দেশ সৃষ্টি হওয়ায় অনেক রাজনৈতিক ধর্মীয় এবং সামাজিক সমস্যা অমীমাংসিতই রয়ে গেছিল। উত্তেজনা বিরাজ করছিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে। জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মৃদুলা মুখার্জি জানান, " বিড়লা হাউসে থাকার সময় টা মোটেও শান্তিপূর্ণ ছিল না মিস্টার গান্ধীর জন্য, চারিদিক থেকে দাঙ্গার খবর তিনি নিজেও পাচ্ছিলেন। তার উপরে হামলা হতে পারে, একথা জেনেও কখনো তিনি নিরাপত্তারক্ষী রাখতেন না। "

বিড়লা হাউসে মিস্টার গান্ধীকে পরিচর্যায় দায়িত্বে ছিলেন ব্রিজ কৃষ্ণা চান্দিওয়ালা, মনু এবং আভা নামে তার কয়েকজন আত্মীয়। ভারত সরকারের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে তিনি এসময় সাহায্য করেছিলেন। তবে মুসলমানদের ওপর হামলা যখন একেবারে থামছিল না তখন তিনি জানুয়ারির ১৩ তারিখে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন করার ঘোষণা করেন। ১৮-ই জানুয়ারি বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা তাকে আশ্বস্ত করেন যে মুসলমানদের ওপর হামলা হবে না। তাদের কথায় বিশ্বাস করে ১৯ তারিখে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন, কিন্তু এর দু'দিন পরেই বিড়লা হাউসে বোমা বিস্ফোরণ হয় এবং ৩০-শে জানুয়ারি নাথুরাম গডসের অভ্যর্থ ভেদে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। সকাল ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা করতেন তিনি, সেখানে ধর্মের কথা বলা হতো। প্রতিদিন অংশ নিতেন কয়েক শ' মানুষ। সেদিনও সন্ধ্যায় প্রার্থনা সভার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন গান্ধীজি। ঠিক সেই মুহূর্তে নাথুরাম গডসে তিনটি গুলি ছোড়েন তার বুক লক্ষ্য করে। ইতিহাসবিদ মোহেল হাশমী বলেছেন গুলি ছোড়ার আগে গডসে গান্ধীজীর দিকে ঝুকে প্রণাম করেন। স্থানীয় সময় বিকেল ৫ টা ১৭ মিনিটে মৃত্যু হয় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর। মি: হাশমী বলেছেন, গুলি ছোড়ার পরে তাকে ঘরে নিয়ে আসা হলেও ধারণা করা হয় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়েছিল। গান্ধীজীর শবযাত্রার মিছিলে প্রায় ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ হয়েছিল।

গান্ধী হত্যার দায় নিয়ে গডসে কে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়েছিল ১৯৪৯- এর ১৫-ই নভেম্বর। দিল্লির লালকেল্লায় গান্ধী হত্যার বিচার চলার সময় নাথুরাম গডসে নিজেও স্বীকার করেছিলেন যে তিনি দেশভাগের জন্য গান্ধীজীকেই দায়ী বলে মনে করতেন। আদালতে বলেছিলেন নাথুরাম গডসে বলেছিলেন "গান্ধীজী দেশের জন্য যা করেছেন, আমি তাকে সম্মান করি। গুলি চালানোর আগে তাই আমি মাথা নীচু করে তাঁকে প্রণামও করেছিলাম" । তার এক সহযোগী নারায়ন আপ্তেরও ফাঁসি হয়েছিল একই সঙ্গে। তার মৃত্যুর 21 বছর পরে তাকে সম্মান জানিয়ে গ্রেট ব্রিটেন সরকার গান্ধীজীর ছবি সহ একটি স্মারক প্রকাশ করেন। "অহিংস ভাবে গোটা বিশ্বকে তুমি আন্দোলিত করতে পারো"— এই মহান বক্তব্যটির বক্তা মহাত্মা গান্ধী। যিনি নিজের পুরো জীবনটাই অহিংস আন্দোলনের মধ্যে কাটিয়েও সহিংসতার মধ্যে খুন হয়েছিলেন। ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে যে নামটি চিরকাল খোদাই হয়ে থাকবে, তিনিই হলেন মহাত্মা গান্ধী।

যুগে যুগে কিছু মানুষ আসেন যাদের নেতৃত্ব, দর্শন পাল্টে দেয় গোটা দুনিয়াকে। মানুষ খুঁজে পায় স্বাধীনতার স্বাদ। তাদের জীবনাচরণ, আদর্শ ও নীতিগত দিক পথ দেখায়। অন্ধকারে তারা আসেন আলোর মশাল নিয়ে। নতুন করে ভাবতে শেখান, নিজেদের অধিকার আদায় করতে শেখান। তেমনি একজন মহামানব কিংবদন্তি মহাত্মা গান্ধী। যার হাতে দমিত হয়েছে ব্রিটিশ শাসকের শাসন। সূচিত হয়েছে স্বাধীনতার সূর্য। জীবনের সবটুকু দিয়ে রচনা করেছেন মানবকল্যাণের বাণী। এই মহান আত্মা সদাজাগ্রত থাক আমাদের হৃদয়ে । আমাদের শির নম্রতার সাথে অবনত হোক তার পদতলে।

NABANITA BHATTACHARYA
Asst. Prof., Bengali
GTTC, Choa, Hariharpara, MSD

FROM MOHAN TO MAHATMA

It has been seventy years since Mahatma Gandhi departed from our midst. But his life and soul continue to animate humanity transcending national and international boundaries. His contribution to human development is far too great and varied to have been forgotten or to be overlooked. Mahatma Gandhi, byname of **Mohandas Karamchand Gandhi**, (Born on October 2, 1869, Porbandar, India & Died on January 30, 1948, Delhi), Indian lawyer, politician, social activist, and writer who became the leader of the nationalist movement against the British rule of India. As such, he came to be considered the father of his country. Gandhi is internationally esteemed for his doctrine of nonviolent protest (satyagraha) to achieve political and social progress.

The life of Mohandas Karamchand Gandhi is a story of heroic effort to establish the values of Truth and Non-violence in human life. He became a messenger, for the people of the world surrounded by fire of violence in the twentieth century. He also became '*The Father of The Nation'*. He saved India and Britain from mutual hate and revenge by resorting to the experiment of Truth and Non-violence in India's struggle for freedom.

This created an atmosphere which made it possible for other countries of Asia and Africa to free themselves without bloodshed from the hold of the European countries which had subdued them in the nineteenth century.In the eyes of millions of his fellow Indians, Gandhi was the Mahatma *("Great Soul").*

Being born in a middle class *Vaishnava* family and brought up in that atmosphere till he joined school and received instruction according to the system then prevailing, he lived, dressed and dined in the way all children of that class did. Later, he went to England for studies and changed his dress to suit the conditions of that country. But in food and certain other matters, he remained true to the lesson he had learnt early in life. On his return to India after being called to the Bar, he passed through difficult times as all beginners in the profession of the law have to do and it was as a lawyer that he went to South Africa to help a client. He had, however, to spend many years there as the condition of Indians and the treatment they received demanded that he should serve them rather than return to India. His struggle with the authorities brought about a considerable change in his life and by the time he returned to India, he had already become a Mahatma. His dress in India on his return was different from what he used to wear when he was practicing as a Barrister and conformed to the old *Kathiawadi* type.

If in South Africa it was the Railway Ticket Collector who paved the way for the birth of a *Satyagrahi,* in India it was a poor peasant from *Champaran*, Rajkumar Shukla, who provided him a platform to test the power of Satyagraha on the Indian soil. His campaign in favour of the *non-co-operation* movement brought about another change which identified his outward appearance with that of the humblest and lowliest of the land and he stuck to the loin cloth till he departed with the name of God on his lips.Mahatma Gandhi was imprisoned several times in his pursuit of non-cooperation and undertook many 'fasts' to protest against the oppression of the down trodden in India.He invented the techniques of mass –civil disobedience in South Africa which were later emulated in India and across the world.

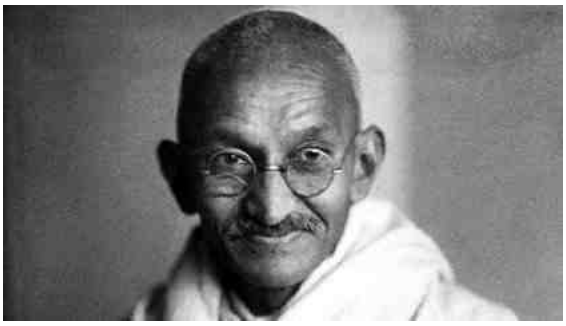

On January 30th, 1948, the assassin's bullet ended the physical existence of Mahatma Gandhi and made him immortal who left an indelible legacy to the mankind –'My life is my Message'.

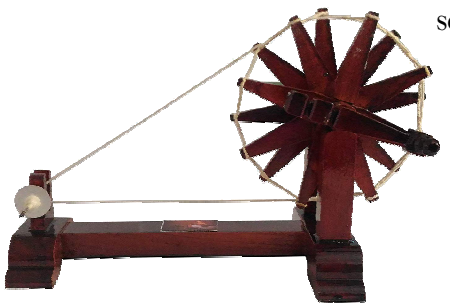

SOURCE : www.gandhi.org.in

JINIA SULTANA
B.ED.– 1ST SEM
SESSION: 2019-21

মহাত্মা গান্ধীর মূল্যবোধ শিক্ষা

"... আমি যে বস্তু দেখিয়াছি তাহার প্রত্যেকটিই ত্যাজ্য অথবা গ্রাহ্য এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছি এবং যাহা গ্রাহ্য বলিয়া বুঝিয়াছি সেই অনুযায়ী আচরণ করিয়াছি। এইভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম যতক্ষণ আমার বুদ্ধিকে এবং আত্মাকে সন্তুষ্ট রাখিবে ততক্ষণ আমি যে পরিণামকে লক্ষ্য করিয়া কাজ করি, তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব।"

গান্ধী দর্শনের মৌলিক প্রত্যয় হলো মানবিক মূল্যবোধ, মানবতাদ যার পূর্বসুরি, গান্ধীজী সেই মহান মানবিকতাবাদী ঐতিহ্যের চূড়ান্ত অভীষ্ঠ মনুষ্য জীবনকে জাগতিক ক্ষেত্রে উন্নীত করার প্রয়াসই ছিল তার জীবন সাধনা, শিক্ষাক্ষেত্রে মানবীয় মূল্যবোধের সুযোগ্য প্রতিফলন অন্যতম সোপান হিসাবে তিনি ন্যায়পরায়নতা সত্যতা ও অহিংসতাকে পাথেয় করেছিলেন, এগুলির বাস্তবায়ন কল্পে তাঁর 'রাষ্ট্রহীন গনতন্ত্র' বা 'রামরাজ্য'- ধারণাটি মূর্ত হয়ে ওঠে। মূল্যবোধ শিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি

মানুষের অন্তর্নিহিত মানবতার উপর অপরিসীম আস্থা নিয়ে বিশ্বাস করেছেন যে, শাশ্বত মানবিক সত্য এবং ন্যায়ের আবেদন লোকতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার স্বার্থ প্রহরীরা অত্যাচারের মননে একদিন সহানুভূতির স্পন্দন জাগ্রত করবে। মূল্যবোধ শিক্ষায় তার আবেদন ছিল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত নৈতিক শক্তির কাছে, তাই তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন আত্মশক্তি উদ্বোধনের। মূল্যবোধ শিক্ষা প্রসঙ্গে গান্ধীজীর ঐকান্তিক মানবিকতাবাদ, মানবতার জন্য অপার প্রীতি, গণমুক্তির জন্য নিয়তধ্যান নিরলস প্রচেষ্টা এবং এই উদ্দেশ্যে আত্মাহুতি, জনসাধারণের সঙ্গে একান্ততার বন্ধ নিশ্চয়ই আগামী প্রজন্মের ভাবি নাগরিকদের যাত্রাপথে অমূল্য সঞ্চয় হিসেবে গণ্য হবে একথা বলাবাহুল্য তাঁর প্রদর্শিত মূল্যবোধকে পাথেয় করেই ও তার সহচর্য অনুরক্ত হয়ে বর্তমান প্রজন্ম এক পবিত্র মানবিক আবেগের উদ্দীপ্ত হবে এবং সেই আবেগের সঞ্চার করবে সমগ্র জনজীবনে, এই স্বতো সারিত মানবিক মূল্যবোধ-শিক্ষায় গান্ধীর চিন্তার ইতিবাচক দিক, সেই অর্থেই তাঁর 'Humanisim' এর অবদান আজও সমান প্রাসঙ্গিক ও তা পর্য্যমণ্ডিত।

KANISKA PAL
Asst. Prof., Education
GTTC, Choa, Hariharpara, MSD

"Literacy in itself is no education. Literacy is not the end of education or even the beginning. By education I mean an all-round drawing out of the best in the child and man-body, mind and spirit."

Mahatma Gandhi

শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্ক

একজন ছাত্রের লেখাপড়ার পেছনে তার শিক্ষক ও অভিভাবকের গুরুত্ব সমান। তাদের সঙ্গে সম্পর্কটা ও সহজ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্ক মোটেও সহজ নয়। একটি ভুল করবার পর ও তার শিক্ষক-শিক্ষিকা বা অভিভাবকের সাথে আলোচনা করার মতো সম্পর্ক কয়েকটা পরিবারের রয়েছে। তাই আমাদের শিশু-কিশোররা নিজেদের ভেতরে গুমরে মরে। ছেলে মেয়েদের বেড়ে উঠার সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ যতদিন যায় তারা নতুন নতুন জিনিসের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে। মুখোমুখি হয় নতুন নতুন পরিস্থিতির। কৈশোর বয়সে খুব আবেগপ্রবণ থাকে ছেলেমেয়েরা তাই তাদের মন বুঝে কথা বলতে হয়। কোন কিছু শিখাতে হলে হুকুম বা বাধ্য না করে বন্ধুর মতো বোঝাতে হয়। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, শিক্ষককে শিক্ষার্থীর ক্লাসের বাইরে কিংবা একাডেমিক কাজ ছাড়াও কথা বলার সময় দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষকরা শুধু শিক্ষক নয় অনেকটা গাইড, ফিলোসফারের এর মত। কেননা সব শিক্ষার্থী শিক্ষিত পরিবার থেকে আসে না, সে ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক হতে পারেন সবচেয়ে কাছের মানুষ। ভারতের নাগরিক পশ্চিমবঙ্গের নিরুপমা রায় ফেসবুকে লিখেছেন, তিনি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সময় হাতে কিছু পয়েন্ট লিখে নিয়ে গিয়েছিলেন। শিক্ষকের হাতে তিনি ধরা পড়েন। তাঁকে অধ্যক্ষের রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। খাতা মিলিয়ে দেখা হয় সেই পয়েন্টগুলো তিনি খাতায় লিখেছেন। অধ্যক্ষ তাকে কোনরকম বকাঝকা না করে তাকে নতুন খাতা দিয়ে বললেন আবার লেখো । এত সুন্দর সহজ সমাধান যে হতে পারে সাধারণত কেউ ভেবে দেখেন না। এখানে নকল করাকে কেউ সমর্থন করছে না। কিন্তু এই বয়সটাই ভালো মন্দ না বুঝে পদক্ষেপ নেওয়ার বয়স। সেই বয়সে শিশু-কিশোরের যেকোনো পদক্ষেপকে শিক্ষক ও অভিভাবকের সহমর্মিতার সঙ্গে দেখতে হবে এবং বোঝাতে হবে। অনেকেই বলেন বিশ, ত্রিশ বা পঞ্চাশ বছর আগেও শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্ক ছিল গুরু-শিষ্যের। শীষ্য যে ভক্তি নিয়ে শিক্ষককে সমীহ করত, শিক্ষকরাও সেই মর্যাদা কে ধরে রাখতে নিজেদের সেই উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য পড়াশোনা করতেন, আদর্শবান হতেন। আধুনিক সময়ে বলা হচ্ছে শিক্ষক হবে বন্ধুর মতো। কিন্তু তারপরেও শিক্ষক সেই সমীহ করবার স্থান কি আগের তুলনায় অনেকটাই হারিয়ে ফেলেননি? যদি হারিয়ে থাকেন তার কারণ কী? উত্তরে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের কারণে এমনটাই ঘটেছে। শিক্ষা জ্ঞান আহরণের বিষয় আর নেই। শিক্ষা হয়ে গেছে ভালো চাকরি পাওয়ার সিঁড়ি। বাণিজ্যিকীকরণ হচ্ছে বলেই একই শিক্ষকের ক্লাস করে এসে তার কাছে প্রাইভেট না পড়লে ভালো নাম্বার পাওয়া যাচ্ছে না। বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সমান নজরে দেখেন না। হয়তো যে পড়াশোনায় ভালো তার প্রতি বেশি নজর দিচ্ছেন, ফলে শিক্ষার্থীর মনে ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে, ভীতির সঞ্চার হচ্ছে। তাদের মধ্যে হীনমন্যতা দেখা দিচ্ছে। তাই শিক্ষকের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সমান নজরে দেখা খুবই প্রয়োজন। আর শিক্ষককের বন্ধুর মতো মিশে শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলি জেনে একজন পথপ্রদর্শকের মতো সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া এবং গাইড করা প্রয়োজন।

All of Mahatma Gandhi's possession, captured in 1938

JANNATUN FERDOUS
D.EL.ED.- 2nd YEAR
SESSION: 2018-2020

গান্ধীজির জীবন দর্শন

মানবতাবাদী ভারত-গৌরব মহাত্মা গান্ধী একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে পরিচিতি ছিলেন না, তিনি ছিলেন অহিংসা মানবাধিকার এবং সত্যের একনিষ্ট পুজারী। গান্ধীজির দর্শন পর্যালোচনা করলে দেখা যাই অহিংসা তাঁর মতবাদ নিজ জীবনের বহুমুখী কর্মধারায় উপর প্রতিষ্ঠিত। গান্ধীজী অহিংসা ধারনাটিকে নিজ জীবনে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন,ন্যায়বিচার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা কালে তিনি যে, সত্য ও অহিংসার নীতি অনুসরন করে গনতান্ত্রিক আন্দোলন সংঠিত করেছিলেন তা হল,তাঁর মতাদর্শের জ্বলন্ত উদাহরণ।গান্ধিজির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল একমাত্র সত্য অনুসরন করে এবং সকল প্রকার হিংসা বর্জন করে মানুষের সর্বোচ্চ আদর্শ অর্থা পুরুষার্থ লাভ করা যায়। গান্ধীজি মনে করেন সহিংস বল প্রয়োগের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সাম্য সুরক্ষিত হয় না এবং হিংসার দ্বারা ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করাও যাই না। গান্ধীজির দর্শন হল কোনো কাজের গৃহিত উপায় উদ্দেশ্যের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা(The mans must justify the end) অহিংসা হল সততা। স পথেই স উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। অর্থা অহিংসার মাধ্যমেই স উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব। হিংসার উ স হল ঘৃণা ও বিদ্বেষ। অহিংসার উপাদান হল ভালোবাসা,উদারতা। হিংসা ঘটায় বিচ্ছেদ আর অহিংসা নিয়ে আসে সৃষ্টি ও সংহতি।

গান্ধীজির অহিংসার ধারনাটি সত্যাগ্রহের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পকে আবদ্ধ। সত্যাগ্রহ অথা অহিংসা ভিত্তিক অসহযোগ আন্দোলন ছিল তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য। এই ছিল সমাজ পরিবর্তনের সর্বো কৃষ্ট পদ্ধতি। অহিংসা শব্দের মুলত দুটি দিক আছে, সদর্থক দিক ও নঞর্থক দিক। গান্ধীজি সদর্থক দিকটিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। অহিংসা বলতে সাধারনত আঘাত না করা বা হত্যা না করাকে বোঝায়। কিন্তু গান্ধীজি এগুলিকে এক একটি উদাহরণ হিসাবে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে যে কোনো ধরনের আঘাত শারীরিক বা মানসিক যাই হোক না কেন হিংসারই নামান্তর। অহিংস হতে গেলে রাগ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি থেকে দূরে থাকতে হবে। একমাত্র ভালেবাসাই পারে মানুষের অন্তরতম আত্মাকে শুদ্ধ রাখতে। ভালবাসার অসাধ্য সাধন হয়, শত্রু বিনাশ হয়, জীবন সার্থক হয়।

গান্ধীজির মতে, স্বরাজ ও সবোদয় এই দুটি লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার অন্যতম পথ হল অহিংসা। কিন্তু দুঃখের বিষয় গান্ধীজির অহিংসা নীতি বাস্তবে কোথাও কার্যকর হয়নি।স্বদেশে স্বাধীনতা আন্দলনের সময় অনেকে সশস্ত্র আন্দলনের পথ অনুসরণ করেছিলেন। গান্ধীজির অহিংসার বানী কিছুটা জৈন ভাবধারার দ্বারা প্রভাবানিত ছিল। তাঁর এই উচ্চমার্গের ভাবধারা কত্রিম বা বাহ্যিক ন বরং আত্মিক। স্বার্থপরতা, হিংসা, মানুষকে মানুষের থেকে দূরে রাখে তাই গান্ধীজি যে অহিংসার বানী প্রচার করেছিলেন তা সর্বদেশে ও সর্ব কালে সমান ভাবে সমাদৃত।

APARAJITA DAS
D.EL.ED.- 2nd YEAR
SESSION: 2018-2020

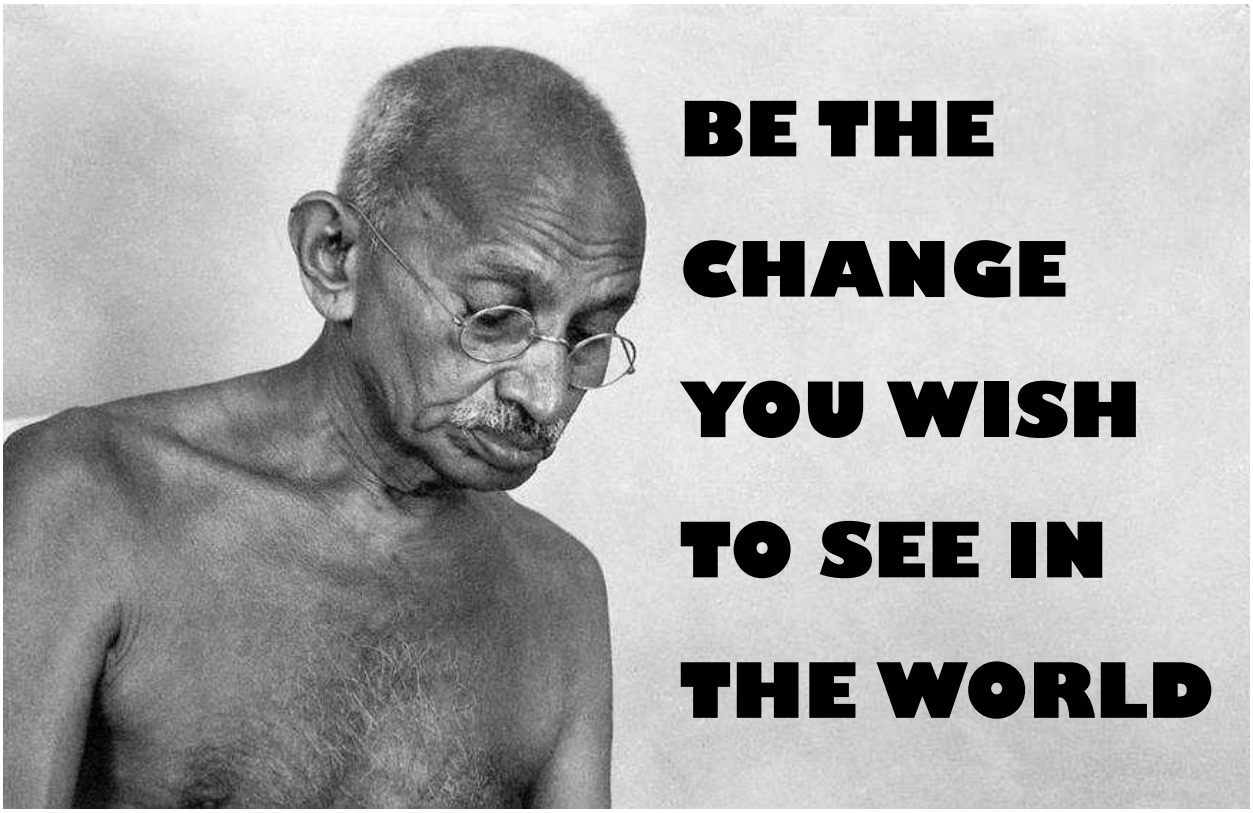

একজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে কেমন সম্পর্ক হওয়া উচিত

T~Talented
E~Educated
A~Adorable
C~Charming
H~Helpfull
E~Encouraging
R~Responsible.

একজন আদর্শ শিক্ষক তিনি এই বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকারী এই দিক গুলি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের জীবনে একজন আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকা কতটা এবং আমাদের পরবর্তী ভবিষ্য গঠনে কতটা কার্যকরী ও প্রভাব বিস্তারকারী। এবার আমরা মূল বিষয়ে আলোচনা করি শিক্ষার্থীদের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য হলো তারা প্রশ্ন করতে খুব ভালবাসে সেই প্রশ্নের উত্তর সবসময় পিতামাতারা দিতে পারেনা কিন্তু শিক্ষকরা প্রতিনিয়ত ধৈর্যের সাথে উত্তর দিতে থাকেন এবং শিক্ষার্থীর জানার চাহিদাকে বাড়িয়ে তোলে। এখন শিক্ষক ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করলে এবং উ সাহিত করলে তারা খুব খুশি হয় ও একে অপরের সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্ক আবদ্ধ হয় এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষণ কৌশল কে আরও সহজ করে তোলে।

আমার নিজের বাস্তব ছাত্রজীবন চলাকালীন এটা মনে হয়েছে যে শিক্ষার্থীরা সব সময় চাই এমন একজন 'Mentor' কে যিনি সবসময় যে কোন পরিস্থিতিতে Mentor কে নিজের সমস্যা বলতে পারবে এবং তিনি সব সময় তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সঠিক পরামর্শ দেবেন। তাই এই Mentor যদি শিক্ষক-শিক্ষিকা হয় তবে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী সম্পর্কটা সার্থক হবে।

শেষ দুটো লাইন আমার প্রিয় টিচারদের জন্য~~~

একজন মা তার সন্তানকে জন্ম দিতে পারেন, কিন্তু একজন আদর্শ শিক্ষক শিশুটিকে মানুষের মত মানুষ তৈরি করতে সাহায্য করে।

SAMIM RANA
D.EL.ED.- ALUMNI
SESSION: 2017-2019

শিক্ষার গুরুত্ব

'শিক্ষা' অদ্ভুত ভয়ানক সুন্দরতম একটি শব্দ। 'শিক্ষার গুরুত্ব' বিষয়টির ওপর গুণীজন নিজস্ব ভঙ্গিমায় আলোকপাত করেছেন। সেসবই জানা রয়েছে সকলের। ভেতরের যাবতীয় সম্ভবনার পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশের সুন্দর ও সাবলীল পন্থা হল শিক্ষা।অন্যভাবে ব্যাখ্যা করলে বলা যায়- বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির যৌক্তিক প্রকাশই হলো শিক্ষা। আবার এইভাবেও শিক্ষাকে বর্ণন করা যায়- সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকার জন্য আমৃত্যু লড়ায়ের সর্বো হাতিয়ারই হল শিক্ষা। এটা বললেও ভুল হয়না-অতীত ও বর্তমান অভিজ্ঞতার মেলবন্ধনের ওপর দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতকে সাজিয়ে তোলার নামই হল শিক্ষা।

ওপরের প্রতিটা সংজ্ঞায় শিক্ষার যে ধারণা পাওয়া যায় তা হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাকে কখনোই পরিপূর্ণ শিক্ষা হিসেবে ধরে নেওয়া উচিত নয়। ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা যখন অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে সম্পর্কের সেতুবন্ধন স্থাপন করতে সক্ষম হয়, তখন তাকে পরিপূর্ণ শিক্ষা হিসেবে গণ্য করা হবে।অর্থা শিক্ষা হল- কল্পনা ও বাস্তবের সুদৃঢ় মেলবন্ধন যার দ্বারা বৃহত্তর সমাজ উপকৃত হবে।

এবার সমস্ত ধারণাকে এক জায়গায় মিশিয়ে দিলে শিক্ষার রূপটা এমন দাঁড়ায়- বৃহত্তর সমাজে নিজেকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানোর দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ায় হল শিক্ষা।

শিক্ষাকে সাধারণত দুইভাবে ভাবতে ভালবাসি। ১) প্রথাগত শিক্ষা ২)কর্মমুখী শিক্ষা বা জীবনমুখী শিক্ষা বা সৃজনধর্মী শিক্ষা।

অনেকেই কর্মমুখী শিক্ষা ও জীবনমুখী শিক্ষাকে একই ছাতার তলে রেখেছেন, কিন্তু বর্তমান সমাজে মানুষের মূল্যবোধের গড়ে যদি করা হয়, তাহলে কর্মমুখী শিক্ষা আর জীবন বা সৃজনধর্মী শিক্ষার মধ্যে ক্রোশ-মাইলের পার্থক্য চোখে পড়বে। তা সত্ত্বেও কর্মমুখী শিক্ষা মানুষের ভেতরের গুণাবলী বিকাশে ধনাত্মক অনুঘটক হিসেবে কাজ করে তা অস্বীকার করার জায়গা নেই।

অন্যদিকে প্রথাগত শিক্ষা যা সাধারণত শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মাঝে একটা ব্যবসায়ীক সম্পর্ক তৈরি করে, যার এক ও অভিন্ন উদ্দেশ্য এটাই- জীবনে একটি চাকরি জুটিয়ে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়া।

''শিক্ষা'' হচ্ছে এক প্রকারের শক্তি যাকে ধারণ করতে হয় সাধনার মধ্য দিয়ে। শিক্ষাকে ধারণ করা হয় দুইভাবে। কেউ শুধু মস্তিষ্কে ধারণ করে,কেউ শরীরের রোমে রোমে ধারণ করে। যারা শক্তিকে শুধু মস্তিষ্কেই ধারণ করেছে,তাদের বেশিরভাগই শিক্ষার অহংকারে ভাসতে দেখেছি। আর যাদের সারা শরীর জুড়ে শিক্ষার শক্তি সমাহিত হয়েছে,তাদের আমি মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে দেখেছি।

শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই পয়গম্বর হজরত মুহাম্মাদ(সাঃ)এর বাণী উল্লেখ করতেই হয়। তিনি বলেছেন- "একজন মূর্খ লোকের সারারাত্রী ইবাদতের থেকে একজন জ্ঞানী মানুষের নিদ্রা উত্তম।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন- "শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড"। তিনি আরো বলেছেন,"বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলায় শিক্ষার লক্ষ্য।"

উপরের বাণীগুলো থেকে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় যে,শিক্ষা মানুষকে আরও সামাজিক, আরও সাংস্কৃতিক, আরও মানবিক করে তুলবে। সত্যিকারের শিক্ষিত মানুষ একটা দেশের সম্পদ। শিক্ষার গুরুত্ব তখনই আকাশ ছোঁবে যখন শিক্ষাকে বিকৃত ভাবে গ্রহণ করে বিক্রিত করা হবেনা।বিক্রিত শিক্ষা কখনোই সমাজের উন্নতিসাধন করতে সক্ষম হয়না। শিক্ষা মানুষকে স্বনির্ভর করে তোলে। শিক্ষা মানুষের ভেতরের অন্ধকারকে দূর করে আলোর আলোড়ন সৃষ্টি করে। শিক্ষা অন্ধত্ব ও জড়তাকে দূর করে। শিক্ষা পরম আত্মার সাথে মিলনের রাস্তা সুগম করে। শিক্ষা মানুষের ভেতরে মূল্যবোধ তৈরি করে।শিক্ষা মানুষের প্রতি মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধকে জাগ্রত করে। শিক্ষার আলোয় সিক্ত যে নয়ন, সে নয়ন যে কোনো কাজকে সমান চোখেই দেখে। শিক্ষা অর্থ দেখে ধনী গরিব বিচার করেনা। শিক্ষার মানদণ্ড আলাদা রয়েছে। অমানবিক হৃদয়ে কখনো শিক্ষার আলো পৌছায় না। শিক্ষা সাম্প্রদায়িকতাকে দূর করে। শিক্ষা সাহিত্যবোধ জাগ্রত করে। শিক্ষা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে জাগ্রত করে।

শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা আজ শুধু প্রথাগত ডিগ্রিধারী মানুষদেরকেই শিক্ষিত মনে করি। ধন্য মনে করি। হয়তো শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য ডিগ্রীতেই ধাক্কা খেয়ে মুষড়ে পড়ে। ডিগ্রী শুধু মাত্র শিক্ষার স্মারকলিপি। মানদণ্ড নয়। বৃদ্ধাশ্রমে শিক্ষিত মানুষদের বাবা-মা'রাই বেশি রয়েছে। সাধারণ মূর্খ মানুষদের আমি স্বচক্ষে দেখেছি গুরুজনদের প্রতি সমীহ প্রকাশ করতে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি শিক্ষিতদের ভিখারীদেরকে গালি দিতে,অবজ্ঞা করতে।

তুমি শিক্ষার গুরুত্বের কথা শোনাতে চাও? নচিকেতার কথা মনে আসে। ও ডাক্টার গানটি নিশ্চয় সবার শোনা। "ক্লিনিক আর ডাক্তার কে বোকা বানাচ্ছে, বুঝবেনা গর্দভ জনগণ", ওনারা কিন্তু উচ্চশিক্ষিত।

কিন্তু শিক্ষার গুরুত্ব তাদের কাছে মূল্যহীন। আমি শিক্ষিত, এই অনুভূতির সাথে তাদের পরিচয় ঘটেনি। কারণ শিক্ষাকে তারা মুড়িমুড়কির মত চাবিয়ে খেয়েছে। শিক্ষার গুরুত্ব তখনই সুন্দর ভাবে অনুভব হবে, যখন শিক্ষার্থী নিজে শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে কৃত্তিম পরিবেশে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর পরিবেশে মেলবন্ধন ঘটাতে পারবে।

শিক্ষার গুরুত্ব তখনই আসবে, যখন শিক্ষার্থীকে নিজের ভেতরের ভুলগুলোকে নিজেদের দ্বারায় যাচায় করিয়ে নেওয়া হবে। সমাজের খামতিগুলোকে, সমাজের চলতে থাকা কুসংস্কারগুলোকে, ধর্মীয় কুসংস্কারগুলোকে তারা নিজেরা যখন শনাক্ত করতে পারবে, এবং সেগুলোকে বন্ধ করতে রুখে দাঁড়াবে, তখনই শিক্ষার গুরুত্ব বা মর্যাদা বাড়বে। তখন এই বাংলা আবার রত্নগর্ভা হবে। ঈশ্বরচন্দ্র, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ তৈরি হবে।

শিক্ষা মানুষকে নম্র করে তোলে। আজ শিক্ষাঙ্গনে তাকালেই দেখা যায় শিক্ষার্থীদের উ রূপটি। একজন শিক্ষার্থীকে কখনোই সে রূপে দেখতে পাওয়া কাম্য নয়। অথচ আমরা এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ব্যক্তিস্বাধীনতার ভেক ধরে। অথচ এই স্বাধীনতা শিক্ষার গুরুত্বকে কমিয়ে আনছে, শিক্ষার অবনমনে আজ সমাজ ধর্ষিত।

শিক্ষক সমাজ আজ অপমানিত। যে সমাজ শিক্ষকের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে সেই সমাজে ডাক্তার থাকুক, ইঞ্জিনিয়ার থাকুক, অফিসার থাকুক, আর যাই থাকুক না কেন, অন্তত মানুষ থাকতে পারেনা। ছড়ি ঘুরানোর লোক থাকা চাই! আমি বলছিনা ছড়ি মানে কাঁচা কঞ্চি! আমি বলছি, শিক্ষকের ভেতরে থাকা শিক্ষা দানের ক্ষমতা। শিক্ষক যদি নিজের মেরুদণ্ড হারিয়ে ফেলে, সেই সমাজে আর যাইহোক অধঃপতন নিশ্চিত। কোনো ঔষধ নেই সেই সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে।

মূল্যবোধ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। তাই বলে উলঙ্গ রূপকে আধুনিকতার মানদন্ডে ফেলতে পারবনা।

মূল্যবোধ হয়তো পরিবর্তন হয়। কিন্তু আমি কঠিন ভাবে বিশ্বাস করি, শিক্ষার কোনো পরিবর্তন হয় না। শিক্ষার অন্তঃসার সবসময় একই থাকে। শিক্ষা মানুষকে মাটির সাথে আঁকড়ে ধরে রাখে। যে উদ্ভিদের শিকড় গভীরে গেছে, তা কী ঝড়ে উলটে যায়?

শিক্ষার গুরুত্ব ঠিক তেমনই।

আজকাল 'বন্ধুত্ব' 'ভালোবাসা' 'মর্যদা' এইগুলো লুপ্তপ্রায় অনুভূতি। ফেসবুক হোয়াটস অ্যাপের যুগে খুলে গেছে অনেক অপশন। তুমি একটার পর একটা পছন্দ করবে, আবার পেছনে ফেলবে। তুমি ক্লান্ত হবেনা। তুমি আরো ভালোকে বেছে নেওয়ার জন্য মূল্যবান কাউকে পদদলিত করে যাবে, বুঝতেও পারবেনা। আজকাল ক্যামেরার কারসাজি আর চুলের উড়নচণ্ডী ফ্যাশনে আটকে মেয়ে/ছেলেদের মন। এরা বেশিরভাগই সম্পর্কের মূল্যবোধকে হারিয়ে ফেলেছে, ফেলছে।

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে একদিন মুখ ফস্কে বলে ফেলেছিলাম- কত সুন্দর ফ্যাশানবেল ছেলেগুলো! মেয়েগুলো পাগল হবেই! বিশ্বাস করুন পাশে থাকা ষাটোর্ধ ভদ্রলোক আমার কথা শুনে মুচকে হেসে বলেন- এদের পেট চিপলেও ভালবাসার বাণী ভদ্রতার সাথে বেরোবেনা! কী যুগ এলো! চেনা দায় কাচের হিরে নাকি আসল হিরে!

আমিও হেসেছিলাম কথা শুনে। আমি তখন বলেছিলাম - তাহলে আমার এই উড়নচণ্ডী অগোছালো দাড়িগুলো কেমন দাদু? উনি বলেছিলেন, *"ঠিক এইভাবে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে রে পাগলা!"*

AYAN BISWAS
D.EL.ED.- ALUMNI
SESSION: 2017-2019

"A teacher who establishes rapport with the taught, becomes one with them, learns more from them than he teaches them. He who learns nothing from his disciples is, in my opinion, worthless. Whenever I talk with someone I learn from him. I take from him more than I give him."

Mahatma Gandhi

শিক্ষক প্রশিক্ষণ এক বাঞ্ছনীয় প্রক্রিয়া

শিক্ষক , এটি এমন একটি শব্দ যার প্রতিটি বর্ণ পৃথক পৃথক অর্থ বহন করে ।
শি = শিষ্টাচার
ক্ষ= ক্ষমাশীল
ক= কর্তব্যপরায়ণতা

একইভাবে Teacher শব্দটিকে ভাঙলেও আমরা দেখতে পাব —

T= Tolerate E= Energetic A= Adorable C= Charming H= Honest E= Encouraging R= Responsible

একজন আদর্শ শিক্ষক হতে গেলে এই গুণগুলি থাকা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। এই গুনগুলি আয়ত্ত করবার জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণের । প্রশিক্ষণ হচ্ছে একটি পরিকল্পিত কার্যক্রম। প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে প্রশিক্ষনার্থীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান , দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা হয়। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন ব্যক্তির জ্ঞান , দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করে, কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে তার যোগ্যতার উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধন করা।

কোন শিক্ষককে শিক্ষক হতে গেলে তাকে কিছু নির্দিষ্ট গুণাবলী আয়ত্ত করতে হয়। এই গুণাবলী গুলি হল— শিক্ষকের একটি নির্দিষ্ট জীবনাদর্শ থাকবে , উপযুক্ত নির্দেশনা দানের , শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনার যোগ্যতা থাকবে। তার নেতৃত্ব দানের ও একটি বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে এবং শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে তার যথেষ্ট জ্ঞান থাকবে ; তিনি ধৈর্য্যশীল , নিরপেক্ষ , বাগ্মী ,পরিবেশ নিয়ন্ত্রক হবেন .....এরকম বহু গুণের আধার হবেন একজন শিক্ষক। সমাজের বিভিন্ন বিত্তধারি যেমন ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার –এরা যেমন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ হয়ে ওঠে , একইভাবে শিক্ষকেরাও শুধুমাত্র শিক্ষক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়েই একজন দক্ষ এবং আদর্শ শিক্ষক হয়ে উঠবেন।

বর্তমানের শ্রেণিকক্ষ গুলি মূলত শিশুকেন্দ্রিক শ্রেণিকক্ষ। শিশুকেন্দ্রিক শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতি, মন্তেসরি পদ্ধতি , ডালটন পদ্ধতি, প্রকল্প পদ্ধতি প্রভৃতি। এই পদ্ধতিগুলো শুধু জানলেই চলবে না, তাকে প্রয়োগ করতেও জানতে হবে । শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানবার এবং প্রয়োগ করবার জন্য একজন শিক্ষককে প্রশিক্ষিত হতে হয়।

প্রাচীনকালে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল মেরুদন্ড ছিলেন শিক্ষক। সেখানে পাইপলাইন থিওরির উপর ভিত্তি করে শিক্ষাদান করা হতো। প্রাচীনকালে মনে করা হতো, শিক্ষক হচ্ছেন জ্ঞানপূর্ণ কলসি এবং শিক্ষার্থী জ্ঞানশূন্য পাত্র। পাইপের মাধ্যমে যেমন পূর্ণ পাত্রের জল , জলশূন্য পাত্রে প্রবেশ করানো হয় .....পূর্ণপাত্র থাকে উপরে আর শূন্য পাত্র নীচে , ঠিক সেভাবেই শিক্ষক রূপ পূর্ণ জ্ঞানের আঁধারের অবস্থান থাকত উপরে এবং শিক্ষার্থীদের অবস্থান নীচে। বর্তমানে এই পরিস্থিতির আপাদমস্তক পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করতে পারি । সেইজন্যই 3-way process -এর মাধ্যমে বর্তমানে শিক্ষার আদান-প্রদান ঘটানো সম্ভব হচ্ছে । এটি হল শিক্ষার্থী -শিক্ষক , শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা মিথস্ক্রিয়া মূলক বা ভাবের আদান-প্রদান মূলক আলোচনা।

বিভিন্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ যেমন– মন্তেসরী, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাগান্ধী প্রভৃতি দার্শনিকদের মতানুযায়ী জন্মগতভাবেই শিশু সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। শিক্ষকদের কাজ হলো সেই সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটানো, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকরা আয়ত্ত করেন সে জাদুকাঠি, যার ছোঁয়ায় পূর্ণ জাগ্রত হয় শিশু হৃদয়, সত্যি হয় বিবেকানন্দের বাণী— “Education is the manifestation of perfection already in man”. এই সত্যকে জাগ্রত করতে সাহায্য করেন শিক্ষক। বর্তমানে শিশুদের মনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে , শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় দেখা যায় শ্রেণিকক্ষের মূল কেন্দ্রবিন্দু হবে শিক্ষার্থী। শিক্ষক, পাঠ্যক্রম, অভিভাবক, শিক্ষা পদ্ধতি সমস্ত কিছু আবর্তিত হবে শিক্ষার্থীদের কেন্দ্র করে। এই পদ্ধতিতে পাঠ্যক্রম, বিদ্যালয়, শৃঙ্খলা রচিত হবে শিশুর মনকে ঘিরে। এই জন্য শিশুকে সঠিকভাবে জানা, শিশুকে বোঝা, ছোট থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত শিশুর বিভিন্ন পর্যায়ের বিকাশ থাকতে হবে শিক্ষকের নখদর্পণে। যা খুব সহজ ব্যাপার নয়, যার জন্য হতে হয় দক্ষ। আর এই দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ অনিবার্য।

আসলে একজন শিক্ষক শুধুমাত্র পুঁথিগত জ্ঞান ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দিয়ে দিলেই কখনো আদর্শ শিক্ষক হতে পারে না। একজন আদর্শ শিক্ষক হতে গেলে শিক্ষার্থীদের মনোভাব দেখে, নিজের মানসিকতাকে তার সমতুল্য করা এবং সেই শিক্ষার্থীদের ঘাটতি বা চাহিদাটা ঠিক কোথায় সেই বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা না থাকলে সেই শিক্ষক-ছাত্র কখনো বন্ধুসুলভ আচরণ করতে সক্ষম হবে না। তাই শিক্ষার্থীর তথা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষকের শিক্ষা আগে প্রয়োজন।

আধুনিক সমাজ শিক্ষকদের কাছ থেকে উচ্চমানের শিক্ষকতা ও উন্নত পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদান দাবি করে। এই দাবিকে পূরণ করার জন্য শিক্ষকদের অবশ্যই দরকার প্রশিক্ষণের। প্রশিক্ষণ এও শিখায় শিক্ষক শিক্ষিকাদের কখনো পিছিয়ে পড়লে হবে না । শিক্ষাদানের গতানুগতিক যে ধারা সেটা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে নতুন কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। শিক্ষকদের জানতে হবে কোথায় কিভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করতে হবে এবং তার সাথে সাথে নতুন কি পরিবর্তন আসছে সেই বিষয়ে Updated থাকতে হবে। So, teachers should always be updated.

কিছুদিন আগে পর্যন্ত শিক্ষাবিদগণ Joyful Learning অর্থা আনন্দপূর্ণ শিক্ষার কথা বলতেন, কিন্তু বর্তমানে তারা Joy of learning অর্থা শিক্ষার মজা এই ভাবনাটিকে অধিক প্রাধান্য দিচ্ছেন। শিক্ষাবিদেরা মনে করেন, শিশুরা তার গৃহ পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ থেকে জ্ঞানাহরণ করে বিদ্যালয় প্রবেশ করে। শিক্ষক মহাশয় তার সেই জানার ব্যপ্তিকে বিকশিত ও প্রসারিত করেন। শ্রেণিকক্ষে গবেষণার ক্রমবর্ধমান একটি সংস্থা প্রমাণ করেছে যে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের ক্ষেত্রে স্পষ্টতই পার্থক্য রাখে। ভার্মান্ট (২০১৪)- এর মতে, *“উচ্চমানের শিক্ষক শিক্ষণ ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থী-শিক্ষার ফলাফলকে প্রভাবিত করে।”* তাই একথা বলতেই হয়,

A teacher is the backbone of our society, but a great teacher is like a candle it consumes itself to light the way for others.

MOPASA ROSE
B.ED. 1ST SEM
SESSION: 2019-2021

THE THREE WISE MONKEYS

It is said that Mahatma Gandhi had very few possessions; spectacles, sandals, a pocket watch, a small bowl & plate, and interestingly, the fifth possession was a statue of the "*Three Wise Monkeys*" whom he named- Bapu, Ketan and Bandar and whom he used to call his 'Gurus'. It was gifted to him by a Chinese visitors at Shantiniketan. These three monkeys have their origin in the writings of Confucius, Taoism, and Japanese Shintoism. They are:

Mi zaru, covering his eyes, **sees no evil;**
Kika zaru, covering his ears, **hears no evil;**
Iwa zaru, covering his mouth, **speaks no evil**.

Together the three embody the proverbial principle to **"See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil."**

"See No Evil":

It means not to look upon anything that is evil. Don't let evil enter into your system, not even for a moment. When you drink old milk or swallow rotten food, you digest it. And when you digest it your body realizes it's no good and releases it quickly, in some way. It's the same with evil. When we see evil, we digest it, and the evil becomes a part of us. We then need to release it in some way, which often has a negative result.

"Hear No Evil":

It also rests on the same principle. When we hear evil, it becomes part of us. Our body absorbs it like a sponge. Again, it's like ingesting rotten food; the body can't hold it, and it needs to come out.

"Speak No Evil":

It is a bit different. Seeing and hearing are two of our five senses (along with touching, tasting, and smelling). But speaking is not a sense, but a production from your own. In a sense, it can be seen as the outcome of the other two. In other words, if you "See No Evil" and you "Hear No Evil" you will then "Speak No Evil" because you will be pure. It's the 1 + 1 = 2 formula.

So, if one tries to be positive in word, deed, and thought, one can avoid doing evil and also avoid falling into the traps of the wicked.

SOURCE : Internet

PUSPITA BID
D.EL.ED. 2ND YEAR
SESSION: 2018-2020

#BEAT_PLASTIC_POLLUTION

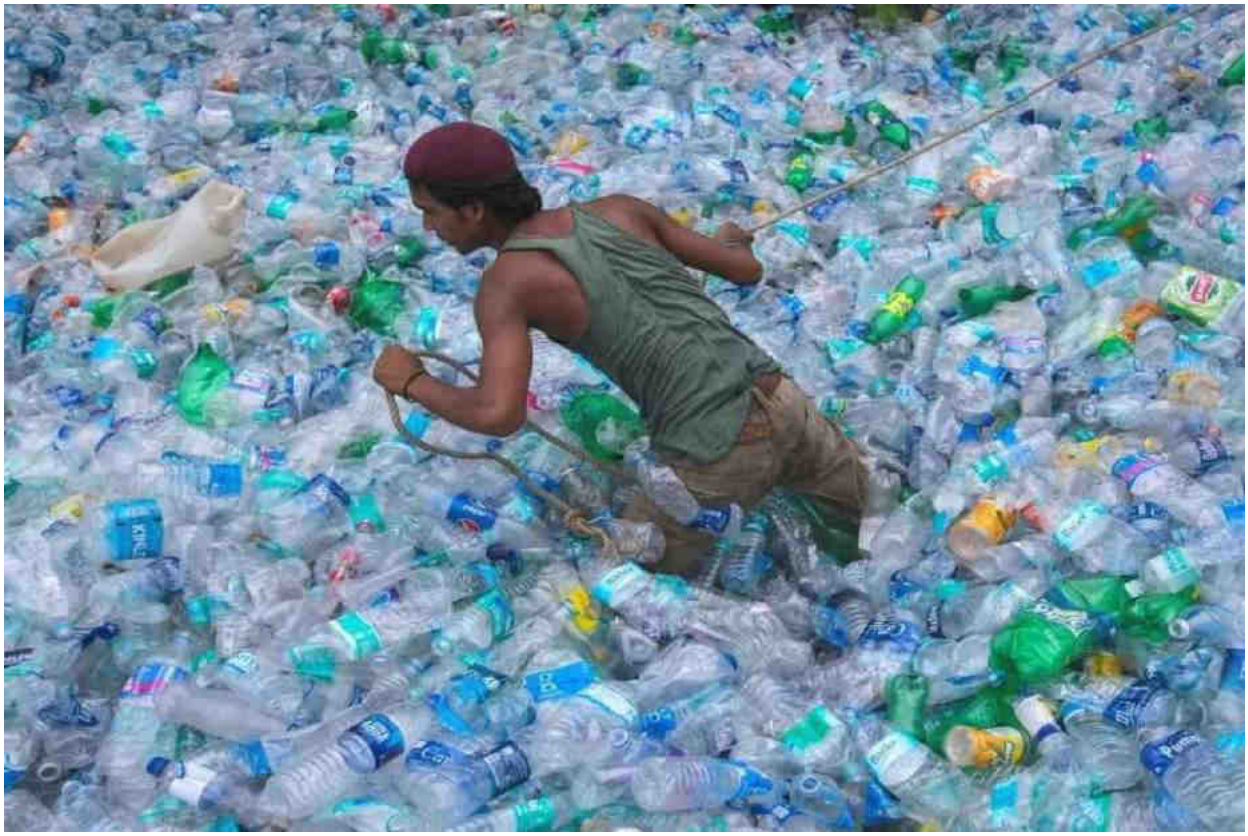

Plastic is widely used in our day to day life and it is present all around us from our house, office and surrounding in the different form of products.

Plastic is a polymeric material that can be easily shaped. It is a non-biodegradable product and the improper disposal of such plastic products in the environment will definitely have a huge impact on the environment and it will also affect the life of living organisms on the earth.

Plastic pollution is caused by the accumulation of plastic waste in the environment. Plastic pollution can afflict land, waterways and oceans. Living organisms, particularly marine animals, can be harmed either by entanglement in plastic objects or problems related to ingestion of plastic waste, or through exposure to chemicals within plastics that interfere with their physiology.

Now important issue is how we can prevent our environment from plastic pollution. The best way to address plastic pollution is to change our mind sets and habits. We should follow *Reduce-Reuse-Recycle* and also *Educate.*

- *Reduce the use of plastic and opt for the better alternatives which are biodegradable.*
- *Many plastic items can be reused or used for different purposes.*
- *Plastic waste should be reprocessed into new products, to reduce the amount of plastic in the waste stream.*
- *And the most important educate people, increase awareness and behavioural change.*

KAUSHIK PAUL
B.ED.- 3RD SEM
SESSION: 2018-20

"We've seen a lot of positive action, but the truth is that **we all need to do MORE**".

Our planet is drowning in PLASTIC POLLUTION

While plastic has many valuable uses, **we have become addicted to single-use or disposable plastic** — with severe environmental consequences. Around the world, one million plastic drinking bottles are purchased every minute, while up to 5 trillion single-use plastic bags are used worldwide every year. In total, **half of all plastic produced is designed to be used only once** — and then thrown away. **More than 99% of plastics are produced from chemicals derived from oil, natural gas and coal — all of which are dirty, non-renewable resources. If current trends continue, by 2050 the plastic industry could account for 20% of the world's total oil consumption. These single-use plastic products are everywhere. For many of us, they've become integral to our daily lives.**

*

By the 1990, plastic waste generation had more than tripled in two decades, following a similar rise in plastic production.

*

In the early 2000s, our output of plastic waste rose more in a single decade than it had in the previous 40 years.

*

Today, we produce about 300 million tones of plastic waste every year. That's nearly equivalent to the weight of the human population.

*

SOURCE : www.environment.org

These 10 rivers alone carry more than 90% of the plastic waste that ends up in the oceans:

Chang Jiang (Yangtze River) 1,469,481 tons

Indus 164,332 tons

Huang He (Yellow River) 124,249 tons

Hai He 91,858 tons

Nile 84,792 tons

Meghna, Brahmaputra, Ganges 72,845 tons

Zhujiang (Pearl River) 52,958 tons

Amur 38,267 tons

Niger 35,196 tons

Mekong 33,431 tons

SOURCE : www.environment.org

"If current trends continue, our oceans could contain more plastic than fish by 2050".

OUR RESPONSIBILITIES ON ENVIRONMENT

Our Earth is a beautiful planet in the universe providing shelter to 7 billion human and millions of species. But We human in turn are cruel to our Earth by selfish activities Mahatma Gandhi said "Earth provides enough to satisfy every mine needs, but not every mans graced".

Everyday tons of plastics, chemical fertilisers are thrown recklessly polluting land, water and air. Harmful gases emitted by Air Conditioners , refrigerators etc depleting Ozone layer leading to skin discuses even cancer.

We aren't aware on saving on saving water resources, as a result *WATER can be as expensive as PETROL.*

Deforestation is leading to floods drought etc causing ecological imbalance.

We all realise the problem but don't want to act for its resolution. The Government and different autonomous bodies like "Green Tribunal" are taking measures to cope up with this problem. We as common people should take a step forward by –

- *Increasing the usage of organic manures.*
- *Planting trees on occasions like festivals, birthdays.*
- *Following 3R's (Reduce, Reuse and Recycle).*
- *Reducing the usage of ACs in our lives.*

Every human being is a trustee of Earth's natural resources for the benefit of the present and the future generations and it is the fundamental duty of every person to contribute to the protection of our environment.

PORNA CHOWDHURY
B.ED.- 3RD SEM
SESSION: 2018-20

"There is a sufficiency in the world for man's need but not for man's greed."

M.K. GANDHI

TEACHER–STUDENT RELATIONSHIP

The mediocre teacher tells.
The good teacher explain.
The superior teacher demonstrates.
The great teacher inspires.

Teaching learning is a co-operative process between teacher and pupils.
Teachers and their students have a special relationship; that what they do affect each other. Based on this special relationship a certain expectation has been developed in the class room environment.
Gradually, some spoken or unspoken rules and system have been establish between teacher and student. On the surface, the main aspect of this relationship has been founded, typically on responsibility and obligation that these individuals feel about each other. Yet in depth there are other elements into teacher and student's relationship which work more than obligation.
Good teacher-student relationships are based on mutual respect. An atmosphere of personal respect develops in the class room when the student have learned to respect the teacher for his or her teaching skills, professional, qualities, knowledge and professionalism. Respect should be two way process and a good teacher will respect each pupils as an individual. In this atmosphere of mutual trust children will attempt to learn better. Immediate feed back and praise for good achievements are essential for good relationship and for providing a positive classroom atmosphere.
However good relationship is between teacher and student it is important for everyone to understand that the teacher is in control of everything in the class room . The teacher has been given the formal authority to be the one "in-charge" over everything that happens. Students will respect a teacher who show fair formal authority, treats everyone the same, values all pupils equally, appreciates hard work and organizes the lesson and teachers well. The act of which, after awhile students will come to understand the personal authority of the teacher.
Thus, the Ideal teacher- student relationship exists when the student is better than teacher.

SUMAN MAJUMDER
B.ED.- 3RD SEM
SESSION: 2018-20

'GURU–SHISHYA'

According to the Vedas, India has always been a seat of high learning and the *Guru-Shishya* relationship is pious and aesthetic. The Guru in the ancient times realized that the qualities of self - esteem, self - confidence, self - restraint and self - respect were the personality traits that the educator tried to inoculate in his pupils. A good teacher can inspire hope, ignite the imagination and instill a love of learning in his students. The bond between a teacher and a student is everlasting in the sands of time because of consistent communication, an emotionally safe learning space, mutual respect and trust. The movies like Chak De India, Taare Zameen Par, Black have conveyed the message how a good teacher enlighten students' lives through dedication and strenuous training. Truly speaking, this whole Cosmos is a teacher that is delivering us vibes. We need to comprehend those universal vibes to make our lives peaceful and meaningful.

SHARMILA BANERJEE
B.ED.- SEM
SESSION:

"First they ignore you,

then they laugh at you,

then they fight you,

then you win."

"There is no school as good as a cultured home and no teacher as good as honest and upright parents".

GITANJALI TEACHERS' TRAINING COLLEGE

" By education, I mean an all-round drawing of the best in child and man in body, mind and spirit"

Mahatma Gandhi

VILL.+P.O.- CHOA, P.S.- HARIHARPARA,
DIST- MURSHIDABAD, STATE- WEST BENGAL,
PIN- 742166

Phone Numbers:
09933777771/ 09609444449
E-mail: gitanjalittcollege@gmail.com
Website: www.gttc.org.in

Education is the most powerful means to change the society; and teachers are the back bone of the society, thus Gitanjali Teachers' Training College aims to establish a pioneer Teacher Education Institution by making component and committed teachers that continuously respond to changing social needs through the discovery and developmental productive work.

102 Years Ago: When Gandhi & Tagore Met For The First Time

THE PROPHET AND THE POET

Tagore was the first notable contemporary to refer to Gandhi as '*Mahatma*'. Gandhiji also called him '*Gurudev*', a term of respect by which many others called the poet. Even before the two actually met, a mutual regard existed between them.

Tagore and Gandhi met for the first time in March 1915 at *Santiniketan*. Kaka Kalelkar, a close associate of Gandhiji, describes this meeting thus:

We knew that both men had a heartfelt respect for each other. Ravibabu made a gesture inviting Gandhiji to sit beside him on the sofa. But as long as there was a carpet on the floor to sit on, Gandhiji was not going to sit on any couch. He settled himself on the floor, Ravibabu had to follow suit.

They met many times after that.... They used to discuss food and diet among other things. Gandhiji being a strict fruitarian, said "To fry bread in ghee or oil to make puris is to turn good grain into poison." "It must be a slow poison' Ravibabu answered gravely. "I have been eating puris all my life and it has not done me any harm so far."

The two seers, Tagore and Gandhi had their ideological differences. It is well-known that Tagore did not see eye to eye with Gandhiji in the matter of the Non-cooperation Movement launched by the latter.

Despite these differences, however, their mutual respect for each other did not diminish and Gandhiji accepted Gurudev's criticism positively.

Gandhi himself has said, of his supposed differences with Tagore, *"I started with a disposition to detect a conflict between Gurudev and myself, but ended with a glorious discovery that there was none."*

SOURCE : **Internet**

ENDNOTE

TEACHER EDUCATION INSTITUTIONS: QUALITY VS QUANTITY

Education is a dynamic process. Teacher performance is the most crucial input in the field of education. Teachers play a vital role in helping people to develop their talents and fulfill their potential for personal growth and well being. One of the most important requirements to promote and strengthen education is the training of teachers. Teacher education is important as efficient teachers can shape an efficient future society. It is rightly said by Kothari Commission "the destiny of India is being shaped in her class room". An efficient, skillful and dedicated teacher only can fulfill and shape the future of students. The teacher education institutions (TEIs) help a lot to do the task fruitfully.

Teacher education in 21st century is a challenge to excellence in every endeavor. Today we need well qualified and well prepared teachers who do not have only academic and professional competencies of high standard but also earnest responsibility and commitment to strive constantly to raise students learning, capacity and achievement so as to make them increasingly autonomous and self-actualizing person to create a bright nation and responsible citizen.

Indian teacher education system has been strengthened a lot during the last couple of years in quantitative aspects than quality perspective. In recent years the number of teacher education institutions has been increased in an alaraming speed. The regulatory body like NCTE,Affiliating Universities,State Higher Education departments are totally failure in measuring qualitative improvement and monitoring the institutions.However,many institutions both government and self financed instutions are getting affiliations without fulfilling requisite norms and standards by paying good amount of money to the visiting team members and members associated in ncte and universities for obtaining recognition and affiliation allover India which is a big challenge for qualitative and quantitative growth of TEIs.NCTE is revising and modifying its regulations from time to time for imparting quality teacher education program and preparation of efficient and skillful teachers still teacher education program has been struggling to strengthen its identity. In the year 2014, NCTE introduced a new regulation which is a big challenge for teacher education institution to maintain balance between policy and practices. As we know NCTE, is a statutory body created by NCTE Act, 1993. It is mandated with the planned and coordinated development of both pre-service and in-service teachers throughout country. But practically it failed to achieve its objective. Faced with a crisis of quality in the pre-service training of teachers, NCTE vide notification 28th April 2017, in the exercise of its power introduced QCI accreditation process for TEIs namely Teach R which is a big challenge for Teacher education program for obtaining good grades.

Poor standards with respect to resources for teacher education, unhealthy financial condition, incompetent teacher educator, privatization of TEIs, Poor selection teacher trainees, lack of proper monitoring of affiliating Universities and NCTE, lack of proper orientation for Internship, school based activities and co-curricular activities, poor attendance of teacher trainees, poor salary structure of teacher education. Lack of qualified Principal and teacher educator, frequent change of norms and standards for TEIs is a big challenge for maintaining quality in Teacher education program and a big challenge for University, NCTE, QCI and policy makers.

DR. AMULYA KUMAR ACHARYA
Asst. Prof., Education
Panihati Mahavidyalaya
Sodepur, Kolkata

A Bilingual E-Magazine

Volume 1, Issue 1

2nd October, 2019

CANVAS

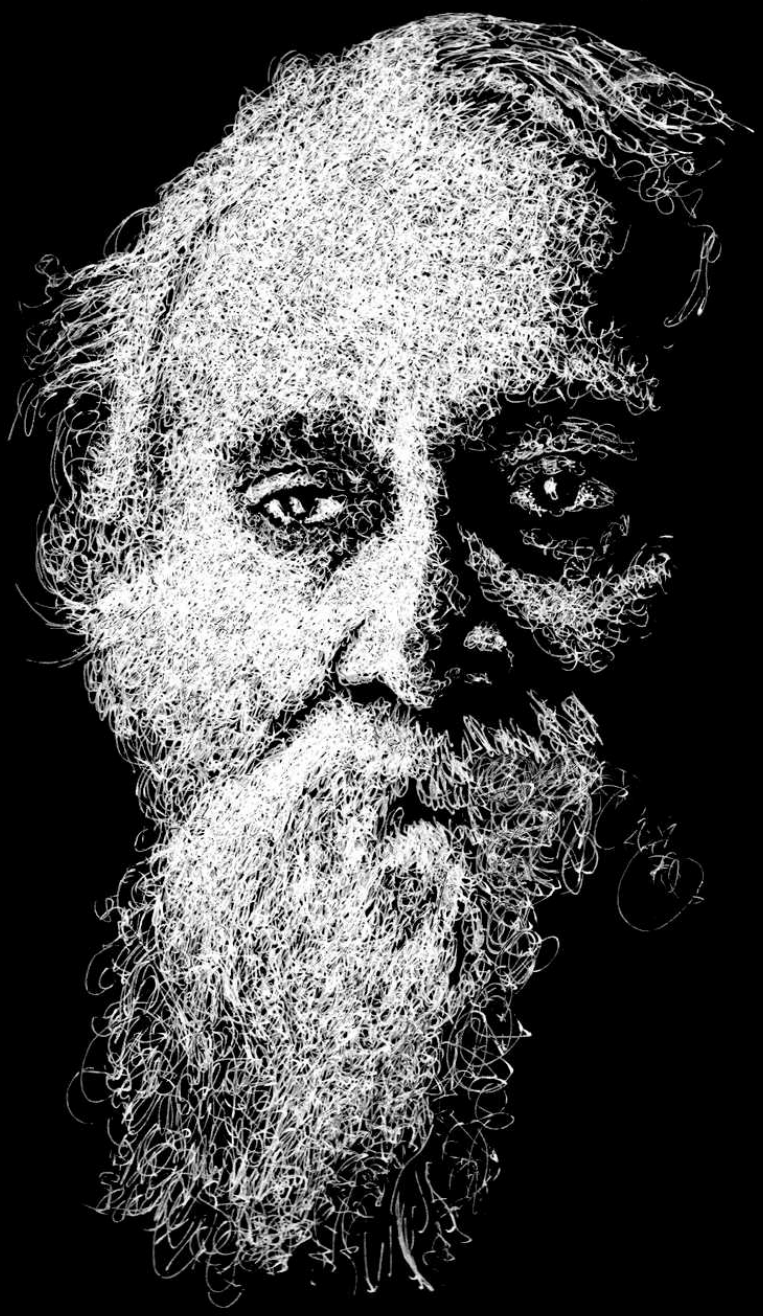

GITANJALI TEACHERS' TRAINING COLLEGE

CHOA, HARIHARPARA, MURSHIDABAD